বৈবর্তনিক বা কোয়ার্ক বোমা (Sapiens Powered Evolutionary Explosion))

ড: প্রণব কান্তি চৌধুরী

১৮০৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন কতৃক বস্তুর পরমাণবিক গঠনের তত্ত্ব প্রকাশ করা সত্ত্বে ও পদার্থবিজ্ঞানে এই পরমাণুর অস্তিত্বকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হয় নি। বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট ম্যাক (Ernest Mach) দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে পরমাণুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তার মতে ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা অনুধাবন যোগ্য নয় (empiricriticism) এমন বস্তুর অস্তিত্ব পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি হতে পারে না। ১৮৯৭ সালে ভিয়েনার ইম্পেরিয়াল সোসাইটিতে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী লুডভিগ বোল্টসমান (Ludwig Boltzmann) পরমাণুর অস্তিত্বের পক্ষে গাণিতিক হিসাব প্রকাশ করেন । কিন্তু বোল্টসম্যানের বক্তৃতায় উপস্থিত আর্নেষ্ট ম্যাক দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে বলেন , "I don't believe that atoms exist!" । প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী আর্নেস্ট ম্যাক ও তার অনুসারীদের অযৌক্তিকভাবে পরমাণুর অস্তিকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অস্বীকার লুডভিগ বোল্টসম্যানের মানসিকতায় প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্বকে সমসাময়িক পদার্থবিদদের কাছে গ্রহণীয় করতে বারবার ব্যর্থ হওয়ার বিষাদে ১৯০৬ সালে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে তিনি আত্মহনন করেন। অথচ, অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে The Big Business Theory এর প্রবক্তারা মানব সভ্যতা বিনাশে সক্ষম পরমাণু অস্ত্রভান্ডারের মজুদ বৃদ্ধির প্রয়াসে একর পর এক যুক্তি আবিষ্কার করে যাচ্ছিলেন। এই উদাহরণ থেকে The Big Business Theory এর মৌলিক দর্শনের আরো একটি দিক পরিষ্কার হয়ে উঠে। তা হল: পরমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পূর্বে পরমাণুর অস্তিত্ব দার্শনিক বিষয়বস্তু , এবং পরমাণু বোমার জন্মের পর পরমাণুর অস্তিত্ব বৃহৎ ব্যবসার বিষয়বস্তু। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় , প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদ নিয়ে আধুনিক সভ্যতার কর্ণধারদের মাঝে অনুরূপ একটি ভাবধারা কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদের ধারণাকে এখন ও পর্যন্ত দার্শনিক বিষয়বস্তুর অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিবর্তনবাদ নিয়ে মানব সভ্যতার নীতি নির্ধারকদের মাঝে যে অজ্ঞতা বিদ্যমান আছে তা নিরসনের জন্য আধুনিক বিশ্বে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী ও বিপুল সংখ্যক প্রাণঘাতী ঘটনাসমূহের একটি বৈবর্তনিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণে দেখা যায় , কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার পরবর্তী সময়ে সংঘটিত গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে কৃষ্টিগত বা বৌদ্ধিক বিবর্তনের নিয়মের লঙ্ঘনের , যেমন

সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ণবাদী চ্যাটেল ক্রীতদাসপ্রথার (racial chattel slavery) প্রচলন , পরিণাম হিসাবে বিবেচনা করা যায় (আধুনিক সভ্যতার খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন, ১ম ও ২য় খণ্ড) । অন্যদিকে, ১৮০৬ সালে মঙ্গোলীয়ান ভলকিশ জাতীয়তাবাদ ও ১৮৭১ সালে জার্মান ভলকিশ জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকে কৃষ্টিগত বা বৌদ্ধিক বিবর্তনের দৃষ্টিতে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈবর্তনিক ঘটনা বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু তৎকালীন বিদ্যমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে এই দুই বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ার বিকাশ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে , বিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত হলোকাস্টকে (১৯৪১-১৯৪৫) একটি বৈবর্তনিক বোমা বা Sapiens Powered Evolutionary Explosion(SPEE) এর বিস্ফোরণ হিসাবে বর্ণনা করা যায়। লেখক প্রণীত একীভূত প্রাকৃতিক বিবর্তনের মডেলে (Unified Model of Natural Evolution) এর Evolutionary Anthropodynamics অনুসারে এই প্রক্রিয়াকে Genghis Khan Syndrome নামে অভিহিত করা যায়। অতএব দেখা যায়, প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদকে (evolutionary science) পরমাণুবিজ্ঞানের (nuclear science) মত The Big Business Theory এর প্রবক্তাদের আগ্রহের বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

চেঙ্গিস খান (Genghis Khan) ১১৬২ সালে বর্তমান রাজধানী উলানবাটরের (Ulan Bator) সন্নিকটে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতৃদত্ত নাম তিমোজিন (Temüjin) । তিমোজিন মঙ্গোলীয় জাতিকে উপজাতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্ত করে সার্বিক মঙ্গোল জাতীয়তাবাদের (Mongolian nationalism) উম্মেষ ঘটান। অর্থাৎ উপজাতীয় সংকীর্ণ বৈবর্তনিক পরিচিতির বদলে সার্বিক ও শক্তিশালী মঙ্গেলীয়ান জাতীয়তাবাদী বৈবর্তনিক পরিচিতির উদ্ভব হয় । তিনি উপজাতীয় সংঘর্ষে বিজয়ী হলে প্রথমে ঐ উপজাতিকে নেতৃত্বশূন্য করতেন , এবং পরে সদস্যদের নিজ উপজাতির সাথে মিশিয়ে নিতেন । এই ভাবে তিনি অনেক উপজাতিকে নেতৃত্ববিহীন করে তার কতৃত্বের প্রসার ঘটান ও উপজাতীয় কৃষ্টির বদলে জাতীয় কৃষ্টি বিকাশের লক্ষ্যে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন উপজাতির নেতৃত্বকে সমূলে বিনাশ করেন । মঙ্গোলীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ তিমোজিনের নেতৃত্বের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। একের পর এক উপজাতিকে নেতৃত্বহীন করে সদস্যদের বিভিন্ন উপজাতির সদস্যদের মধ্যে বিতরন করেন এবং মঙ্গোলীয়ানদের উপজাতীয় অনূভূতির প্রতি আনুগত্যের বদলে জাতীয়বাদী মনোভাব গড়ে তুলেন। তিনি মঙ্গোল জাতির সকল সদস্যসের কল্যাণকামী সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে, সামরিক বাহিনী ও দলের নেতৃত্বে চেঙ্গিস খান মেধাতন্ত্র (meritocracy) চালু করেন। উপজাতীয় বংশ ও আভিজাত্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক নেতৃত্ব নির্বাচন বাতিল করে মেধা ও আনুগত্যের ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্বাচন করার নীতি চালু করেন। চেঙ্গিস খানের এই সকল পরিবর্তন সমাজের সদস্যদের গণতান্ত্রিক

ও আর্থ সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি স্বরূপ। আনুগত্যকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করে চেঙ্গিস খানের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিকে স্বৈরতান্ত্রিক মনে হলেও মধ্যযুগীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশাসনের কার্যকারিতা ছিল সর্বোচ্চ। ফলে , Evolutionary Anthropodynamics অনুসারে সমসত্ত্ব 6-map, 5-map, 4-map , 3-map) বিশিষ্ট ভলকিশ মঙ্গোলীয়ান কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর (volkish Mongolian cultural population) উদ্ভব হয়। ১২০৬ সালে মঙ্গোলীয়ার সর্বোচ্চ পরিষদ সারা মঙ্গোলীয়ার তিমোজিনের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাকে চেঙ্গিস খান (Genghis Khan) বা Universal Ruler উপাধিতে ভূষিত করে।

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের পতনের পর ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস হলি রোমান সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী ৩৯টি ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে জার্মান কনফেডেরেশান (German Confederation) তৈরী কার হয়। এই কনফেডেরেশন থেকে দুইটি শক্তিশালী জার্মানভাষী রাজ্য প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে পৃথক রাখা হয়। অস্ট্রিয়ান রাজনীতিবিদ প্রিন্স ম্যাটেরনিক (Prince Metternich) এই কনফেডেরেশনকে প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মাঝে বাফার জোন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রথম ফরাসী সাম্রাজ্যের (১৯০৪-১৯১৪) প্রভাবে মধ্য ইউরোপের জার্মানভাষী রাজ্যসমূহে জার্মান জাতীয়তাবাদী চেতনার উম্মেষ ঘটে। একক ভাষা এবং ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী বিশাল জার্মান জাতিগত জনগোষ্ঠীর মাঝে এই জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে আবির্ভুত হয়। প্রুশিয়ান মন্ত্রী অটো ভন বিসমার্কের (Otto von Bismarck) নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালের অস্টো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে প্রুশিয়ার বিজয় জার্মান রাজ্যগুলোর উপর প্রুশিয়ার কতৃত্ব স্থাপন করে । ১৮৬৮ সালে পরাজিত অস্ট্রিয়া প্রুশিয়ার নেতৃত্বাধীন জার্মানভাষী জনগোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্রের সাথে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান দ্বৈত সাম্রাজ্য (dual empire) গঠন করে। ফলে , অস্ট্রিয়ার বৃহৎ জনগোষ্ঠী জার্মানভাষী নাগরিকদের মাঝে সর্বজার্মান সচেতনতার (pan-germanism) উম্মেষ ঘটে। উল্লেখ্য, অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী নাৎসী (Nazi) নেতা এডলফ হিটলার (Adolf Hitler) সর্বজার্মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘোর সমর্থক ছিলেন। ১৮৭০-৭১ সালে ফ্রান্স ও উদীয়মান শক্তি প্রুশিয়ার মাঝে যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন (Napoleaon III) পরাজিত হন। জার্মান বাহিনী প্যারিস দখল করে এবং প্যারিসের রাজপ্রসাদ থেকে দ্বিতীয় জার্মান একীভূত সাম্রাজ্যের (second Reich) ঘোষণ করা হয়। ১৮৭১ সালে জার্মান একত্রীকরণ ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাইলফলক। ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে জার্মান দার্শনিক জোহান গটলিয়েভ ফিশে (Johann Gottlieb Fichte) বলেন," The first, original, and truly natural boundaries

of states are beyond doubt their internal boundaries. Those who speak the same language are joined to each other by a multitude of invisible bonds by nature herself, long before any human art begins; they understand each other and have the power of continuing to make themselves understood more and more clearly; they belong together and are by nature one and an inseparable whole ." বৈবর্তনিক দৃষ্টিতে এই উক্তিটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, জার্মান একত্রীকরণের ফলে জার্মানভাষী জনগনের বৈবর্তনিক চিত্র 6-map এবং 3-map এর সমসত্ত্বতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং জার্মান জনগোষ্ঠীর বৈবর্তনিক সুসংহতি বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২০৬) চেঙ্গিসখানের নেতৃত্বে এশিয়ার সভ্য জনগোষ্ঠী কতৃক অবহেলিত মঙ্গোলীয় ভূখন্ডে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলো থেকে একটি এককভাষী জাতীয়তাবাদী কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল। এই ধরণের ভাষাভিত্তিক জাতীয়বাদী ও বৈবর্তনিকভাবে সুসংহত জনগোষ্ঠীকে ভলকিশ (volkish population) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অনুরূপভাবে, ১৮৭১ সালে জার্মান ভলকিশ জনগোষ্ঠীর আবর্ভিাব হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিবেশ চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য বিস্তারের অনূকূলে ছিল। প্রতিবেশী প্রাচীন চীনা সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিপর্যস্ততা , ইউরোপীয়ান রাজ্যসমূহে ক্রুসেডে শক্তিহীনতা, মধ্য্ এশিয়ায় শক্তিশালী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি, এবং বাগদাদে আব্বাসীয় খেলফতী সাম্রাজ্যে সামরিক দুর্বলতা ইত্যাদি একযোগে এশিয়া মহাদেশে এক ধরনের সাম্রাজ্রবাদী নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরী করেছিল । চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে চৌকস অশ্বারোহী বাহিনী সমৃদ্ব এবং ভলকিশ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী সফল ভাবে এই পরিবেশকে ব্যবহার করে বিশ্বের ইতিহাসে একমাত্র একক সংলগ্ন ভুমি বিশিষ্ট Pax Mongolica নামক সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। কালের প্রবাহে এই বৈবর্তনিকভাবে সুস্থ সাম্রাজ্য কৃষ্টিগত আত্মীকরণের মাধ্যমে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কুবলাই খানের সাম্রাজ্য চীনা সংস্কৃতির মাঝে , মধ্য এশিয়ার চাকতাই খানেট ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিশে তিমুরীয় ও মোগল সাম্রাজ্যের জন্ম দেয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভুত জার্মানভাষী ভলকিশ জনগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খা বাস্তবায়নের পথে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবশেবাদী ব্যবস্থা প্রবল প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দেয়। ১৮৭১ থেকে ১৯৪৫ এই সময়ের বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে একীভূত জার্মান ভলকিশ জনগোষ্ঠীর "Place under the Sun " অর্জনের প্রচেষ্টা সিংহ ভাগ দখল করে আছে। উদাহরণ স্বরূপ , মরক্কো সংকট (১৯০৫, ১৯১১) , প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ব (১৯৩৯-১৯৪৫) । এই সময়কালে সংঘটিত হলোকাস্টকে সব ইতিহাসবিদ এডলফ হিটলারের প্রচন্ড ইহুদী বিদ্বেষী রাজনীতির পরিণাম হিসাবে

ব্যাখা করতে অভ্যস্ত। বৈবর্তনিক বিশ্লেষণে দেখা যায় , এই হলোকাস্ট সংঘটনের জন্য পরিস্থিতি ১৮৭১ সালে অর্থাৎ হিটলারের জন্মের ১৮ পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল । জার্মান ভলকিশ জনগোষ্ঠীর weltpolitik এর মাধ্যমে "Place under the Sun " অর্জনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী উপনিবেশ ব্যবস্থার কর্ণধার ব্রিটেন , ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সাথে সামরিক সংঘাতের রূপ নেয়। ফলে, ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় এবং ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম কতৃক জার্মানীর উপর আরোপিত অসম ভার্সাই চুক্তি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে অবশ্যাম্ভাবী করে তুলে। এ থেকে বোঝা যায় , ইউরোপে সংঘটিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ব মানব প্রজাতির বৌদ্ধিক বিবর্তনের ফসল । এই সত্যটিতে বোঝানোর জন্য Evolutionary Anthropodynamics নামক বিজ্ঞানের শাখায় Genghis Khan Syndrome এর আবতারণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত হলোকাস্টকে Genghis Khan Syndrome এর ফলে সৃষ্ট বৈবর্তনিক বোমা বা Sapiens Powered Evolutionary Explosion(SPEE) হিসাবে বর্ণনা করা যায়। জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রভাবে জার্মানভাষী ইউরোপীয় ইহদি ডিয়াস্পরার সেকুলার পন্থী বুদ্ধিভিত্তিক পেশাজীবিদের মাঝে জায়নবাদী আন্দোলনের আবির্ভাব হয় । ফলে, জার্মান জাতিভিত্তিক ভলকিশ কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠী ও জার্মানভাষী জায়নবাদী কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠী নামক একই সময়ে একই স্থানে দুইটি সহ বিবর্তনশীল কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এই দুই আন্দোলনের উভয়ের উদ্দেশ্য "Place under the Sun " অর্জন। জার্মান ভলকিশ জনগোষ্ঠীর লক্ষ্য বিশ্বে উপনিবেশবাদী আধিপত্য বিস্তার এবং জায়নবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব বাসভূমি প্রতিষ্টা। উভয় লক্ষ্য অর্জনের পথে হিমালয় পর্বতসম প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান ছিল। আপাতঃদৃষ্টিতে উভয় প্রকল্প বাস্তবতার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না । একীভূত জার্মানীর পক্ষে ব্রিটিশ ,ফরাসী অশ্বেতাঙ্গ উপনিবশে ছিনিয়ে নেওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্য ছিল। তদুপরি , এশিয়ায় ব্রিটিশ, ডেনমার্ক ও ফরাসী উপনিবেশগুলোতে ইতিমধ্যে ঘনীভূত স্বাধীনতা আন্দোলনকে হিসাবে নিলে এই প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা আরো হ্রাস পায়।। অন্যদিকে, একক ভাষাবিহীন ইহুদী সর্বইউরোপীয় ডিয়াস্পরা জনগোষ্ঠীর প্যালেস্টাইনী অভিমূখী স্বাভাবিক হারে অভিবাসনের মাধ্যমে সীমিত সময়ে এক কোটির অধিক ইহুদী জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশকে নিজস্ব আবাসভূমিতে স্থানান্তর করা দুঃসাধ্য ছিল । জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হারকে হিসাবে নিলে এই সম্ভাবনা আরো হ্রাস পায়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় জনগোষ্ঠী তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে বৌদ্ধিক বিবর্তনের নীতিমালাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে নি। জার্মান জনগোষ্ঠীর জন্য সুষ্ট বৈবর্তনিক পথ ছিল্ এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন করা এবং উপনিবেশ মুক্ত বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার

করা। কিন্তু জার্মান জাতি সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে এক অস্বাভাবিক বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয় এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। (১ম খন্ড: ছক ৫.৫ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বৌদ্ধিক বৈবর্তনিক প্রক্রিয়া সমুহ, পৃষ্টা:৩৩১-৩৩২) এই অস্বাভাবিক জার্মান ভলকিশ জনগোষ্ঠীর "Place under the Sun" অর্জনের আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে (১৯২০-১৯৪৫) উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতা এডল্ফ হিটলারের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৭ সালে সালে ব্রিটিশ সরকার কতৃক ঘোষিত বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) জায়নবাদী আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করে। অন্যদিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মান জাতির উপর ব্রিটিশ ,ফরাসী ও বেলজিয়াম সরকার শত্রুতামূলক ও চরম অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিল। সুযোগান্বেষী বুদ্ধিজিবী এডল্ফ হিটলার জায়নবাদী আন্দোলন ও জার্মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাঝে সৃষ্ট এই বিভেদকে সিদ্ধহস্তে ব্যবহার করেন। তিনি সুকৌশলে আমেরকিা যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্ট শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বকে আর্য শ্রেষ্ঠত্বে, মেনিফেস্ট ডেস্টিনিকে lebensraum ও সিক্স ফোবিয়াকে কমিউনিষ্ট বিদ্বেষে রূপান্তরিত করে ভার্সাই চুক্তির প্রণেতাদের কাছে তার আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেন। সেই সাথে অষ্ট্রিয়ায় ভিয়েনায় বাসকালীন সময়ে অর্জিত ইহুদী বিদ্বেষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপকভাবে সঞ্চালিত করতে সমর্থ হন। হিটলার ভলকিশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ জার্মান জাতিকে বৈবর্তনিকভাবে বিষ্ফোরণম্মুখ পরিস্থিতিতে উন্নীত করেন। স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধে পরাজয়ের (১৯৪২-৪৩) পর হিটলার জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের সম্ভাবনাকে আঁচ করেতে পারেন । আসন্ন পরাজয়ের প্রেক্ষিতে নাৎসী বাহিনী তাদের ইহুদী বিতাড়ন নীতিকে ইহুদি নিধন প্রকল্পে পরিণত করে। একক ভাষা ও একক ভূমি বিহীন ইউরোপীয় ইহুদী ডিয়াস্পরা জনগোষ্ঠীর হিটলারের এই প্রকল্পকে প্রতিরোধ করার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। উপরন্তু, এই ডিয়াস্পরা জনগোষ্ঠীর বৌদ্ধিক ও বুদ্ধিভিত্তিক পেশাজীবিরা , যেমন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, আমেরিকা আশ্রয়গ্রহন করে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করেত ব্যস্ত ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, হলোকাস্টকে একটি বৈবর্তনিক বোমা বা Sapiens Powered Evolutionary Explosion(SPEE) ব্যতীত আর কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা বৈবর্তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বর্ণনা নয়।

একীভূত প্রাকৃতিক বিবর্তনের মডেলে হলোকাস্টকে কোয়ার্ক (quark) বোমা হিসাবে অভিহিত করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে , পরমাণুর অভ্যন্তরে তিন ধরণের কণা বিদ্যমান : ইলেকট্রন, নিউক্লিয়ন (প্রোটন ও নিউট্রন) এবং কোয়ার্ক (u-কোয়ার্ক ও d-কোয়ার্ক) । আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরমাণুর অভ্যন্তরের কণাসমূহ প্রাণের উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও বিনাশে বিভিন্নভাবে অবদান রাখে। ইলেকট্রন বস্তু জগতের সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে। জৈব রাসয়নিক প্রক্রিয়া , যেমন খাদ্যের হজম প্রক্রিয়া, ইলেকট্রনের বিভিন্ন কক্ষপথে স্থান পরিবর্তনের ফলে নি:সৃত শক্তি থেকে উদ্ভুত

তাপশক্তির ফলে সম্পন্ন হয়। আবার এই তাপশক্তির নির্গমনের হারকে দ্রুত বৃদ্ধি করে বিজ্ঞানীরা প্রচলিত বোমা (conventinal bomb) তৈরী করেন। এই বোমার আঘাতে কিছু সংখ্যক ঘরবাড়ী ধ্বংস ও প্রাণের সংহার হতে পারে। আবার , পরমাণু কেন্দ্রে নিউক্লিয়নের (প্রোটন ও নিউট্রন) বিন্যাসে পরিবর্তন করে প্রচুর পরিমান শক্তি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে জৈবজগতের সকল প্রজাতি কতৃক ব্যবহৃত তাপ শক্তির একমাত্র উৎস সূর্য। সূর্যের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়নের বিন্যাস পরিবর্তনের ফলে এই তাপ শক্তি নির্গত হয় এবং তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি রূপে পৃথিবিতে পৌছে সমস্ত জীবগতের অস্তিত্বকে রক্ষা করে। অন্যদিকে , কৃত্তিম উপায়ে উপায়ে সৃষ্ট নিউক্লিয়নের বিশেষ অস্থিতিশীল সমাবেশ (unstable collection) থেকে প্রাপ্ত নিউক্লিয়নের শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে পরমাণবিক বোমা (nuclear bomb) তৈরী করা হয়। এই বোমা প্রয়োগে বিশাল নগর ও লক্ষাধিক প্রাণের মূহুর্তের মধ্যে বিনাশ সম্ভব। যেমন , হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় , পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রতিটি কণা বিভিন্ন উপায়ে এই মহাবিশ্বে প্রাণের সংরক্ষণ ও বিনাশে ভূমিকা রাখে। এবার প্রাণের অস্তিত্ব ও বিনাশে কোয়ার্কের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধের লেখক আবিষ্কার করেন, পরমানু অভ্যন্তরে অবস্থিত d-কোয়ার্ক একাকী মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভবের সাথে জড়িত সৌর মন্ডলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন প্রাণবাহী গ্রহ ও কেন্দ্রীয় নক্ষত্রের ভর, জীবনের উপযোগী পরিবেশের তাপমাত্রা সম্পর্কিত তথ্য বহন করে। (https://doi.org/10.59973/ipil.164) পরবর্তী তিন দশকে এই তথ্যের ভিত্তিতে লেখক একটি একীভূত প্রাকৃতিক বিবর্তনের মডেল (Unified Model of Natural Evolution) প্রণয়ন করেন। (https://doi.org/10.59973/ipil.156) এই মডেলে মানব সমাজকে কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠী বা বৌদ্ধিক তন্ত্রের সমাবেশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর বিবর্তনকে বিভিন্ন জৈবিক প্রতিসাম্য (life symmetry) এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (intellectual field) এর সাহায্যে বর্ণনা করা হয়। (২য় খন্ড: পরিশিষ্ট ২ পৃষ্টা:৩৫৩) বৌদ্ধিক ক্ষেত্র IF3 - বৈবর্তনিক পরিচয় (evolutionary identity) ও IF6 – ভাবাদর্শগত (ideological) একযোগে কোন ভলকিশ জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে উত্তেজনা করতে ব্যবহার করা হয়। এডলফ হিটলারের নাজী জনসভাকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তিনি জার্মান জনগোষ্ঠীর বৈবর্তনিক পরিচয় ও ভাবাদর্শভিত্তিক সচেতনতাকে উত্তেজিত করে সমাজের সদস্যরকে পরমাণুর ন্যায় উত্তেজিত করে যাচ্ছেন। অতএব, হলোকাস্টকে এই উত্তেজনা থেকে উদ্ভুত সংকট হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যেহেতু এই উত্তেজনা সৃষ্টিতে কোয়ার্ক থেকে উদ্ভুত জৈবিক সচেতনতা বা বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের ভূমিকা বিদ্যমান তাই হলোকাস্টকে কোয়ার্ক বোমা (quark bomb) হিসাবে বর্ণনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী নয়।

আরো তথ্যের জন্য আমার ওয়েবসাইট : www.anthropodynamics.com । আমার গ্রন্থ " আধুনিক সভ্যতার দুই খলনায়ক : কলম্বাস ও আইনস্টাইন " www.rokomari.com এ বিক্রয় হচ্ছে।